ইউনিট ১৪

বিভাগ-পূর্ব রাজনীতি (১৯৩৭-১৯৪৭)

ভূমিকা

বিংশ শতাব্দীর ৩০ -এর দশকে ভারতে হিন্দু-মুসলিম বিভেদের পটভূমিতে শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের জন্য প্রদত্ত বিভিন্ন পদক্ষেপ যখন ব্যর্থ হয়, তখন ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন প্রর্বতন করেন। এ আইন প্রবর্তনের পর ভারতের রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সূচিত হয়। ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ভারতে দলীয় রাজনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। ভারতীয়দের স্বাধীনতা আন্দোলন জোরদার হয়। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে মুসলমানরা নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি জানায়। এ সময় ভারতের রাজনীতি সুস্পষ্টভাবে অনৈক্যের দিকে ধাবিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে (১৯৩৯-১৯৪৫) ব্রিটিশ সরকার একটি শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে উপমহাদেশকে ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য বিভিন্ন উপায়ে চেষ্টা করে। কিন্তু সরকারের কোন চেষ্টাই সফল হয়নি। হিন্দু-মুসলিম অনৈক্য ও সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটলে শেষ পর্যন্ত ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ সরকার ভারতের স্বাধীনতা দানে বাধ্য হয়। ভারত বিভক্ত হয়, অভ্যুদয় ঘটে পাকিস্তান ও ভারত নামক দুটি রাষ্ট্রের। এই ইউনিট পাঠ শেষে আপনি ১৯৩৭ সালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক নির্বাচন, লাহোর প্রস্তাব ও এর পরবর্তী সময়ে ভারতের শাসনতান্ত্রিক সংকট সমাধানের নানা চেষ্টা সম্পর্কে অবহিত হবেন এবং ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসান এবং ভারত বিভক্তির পটভূমি আলোচনা করতে পারবেন।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ–

- ➔ পাঠ ১ : ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন এবং বাংলার রাজনৈতিক দলসমূহ
- ➔ পাঠ ২ : বঙ্গীয় মন্ত্রীসভা (১৯৩৭-১৯৪৭)
- ➔ পাঠ ৩ : লাহোর প্রস্তাব (১৯৪০)
- ➔ পাঠ ৪ : ক্রীপস প্রস্তাব ও পরবর্তী রাজনীতি (১৯৪২-৪৬ সাল)
- ➔ পাঠ ৫ : ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা (১৯৪৬)
- ➔ পাঠ ৬ : স্বাধীন অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ (১৯৪৭)
- ➔ পাঠ ৭ : ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন : স্বাধীন ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয়

পাঠ-১ : ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন এবং বাংলার রাজনৈতিক দলসমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি—

- ☞ ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- ☞ নির্বাচনের ফলাফল ও এর গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

১.১ ১৯৩৭ সালের নির্বাচন ও রাজনৈতিক দলসমূহ

১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন বাংলার ইতিহাসে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ১৯৩৬ সাল হতে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মতো সারা বাংলায় নির্বাচনের তোড়জোর আরম্ভ হয়। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাংলায় তিনটি প্রধান রাজনৈতিক দলের তৎপরতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। রাজনৈতিক দল তিনটি হচ্ছে—

ক. জিন্নাহর নেতৃত্বাধীন পুনর্গঠিত মুসলিম লীগ;
খ. এ.কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন কৃষক-প্রজা পার্টি এবং
গ. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস।

উল্লেখ্য যে, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ ছিল জাতীয় ভিত্তিতে গঠিত সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠন। অন্যদিকে কৃষক-প্রজা পার্টি ছিল সম্পূর্ণভাবে পৃথক এবং প্রদেশ পর্যায়ে গঠিত বাংলার একটি রাজনৈতিক সংগঠন।

১.২ কৃষক-প্রজা পার্টি

১৯৩৭ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা প্রভৃতি সংগঠন স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে নির্বাচনী ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করে নির্বাচনী প্রচারণায় লিপ্ত হয়। কৃষক-প্রজা পার্টিও ১৪ দফা কর্মসূচি সামনে রেখে নির্বাচনী প্রচারণায় অবতীর্ণ হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এসময় সংগঠন হিসেবে বাংলায় কৃষক-প্রজা পার্টি যথেষ্ট সক্রিয় ও শক্তিশালী ছিল। ১৯২৯ সালে স্যার আবদুর রহিম 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি' গঠন করেন। ১৯৩৫ সালে এ. কে. ফজলুল হক এ দলের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৩৬ সালে প্রজা সমিতির নতুন নামকরণ করা হয় 'কৃষক-প্রজা পার্টি'। কৃষক-প্রজা পার্টি গঠনের মাধ্যমে বাংলার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও আন্দোলনের প্রকৃতিতে পরিবর্তন আসে। এ দেশের রাজনীতিতে মধ্যবিত্তের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। ফজলুল হকের প্রচেষ্টায় অতি অল্প দিনের মধ্যে কৃষক-প্রজা পার্টি গ্রাম বাংলার মেহনতি মানুষের জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ১৯৩৬ সালে এ দলের পক্ষ থেকে 'চৌদ্দ দফা' নামক একটি ইশতেহার প্রকাশ করা হয়। এ ইশতেহারের প্রধান বিষয়গুলো ছিল- বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ, খাজনার হার কমানো, নযর ও সেলামী রহিতকরণ, ঋণ শালিসি বোর্ড গঠন, বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা চালুকরণ, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ইত্যাদি।

১.৩ ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি ও নিউ মুসলিম মজলিশ পার্টি

১৯৩৭ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে ১৯৩৬ সালে নবাব হাবিবুল্লাহ্র নেতৃত্বে রক্ষণশীল মুসলিম নেতৃবৃন্দ কলকাতায় 'ইউনাইডেট মুসলিম পার্টি' নামে একটি দল প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ছিল অভিজাত উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী, রক্ষণশীল মুসলিম নেতা ও মুসলিম ব্যবসায়ীদের দল। সোহরাওয়ার্দী এই দলে যোগদানের ফলে এ দল বিশেষ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তিনি এটিকে গণমুখী সংগঠন করার জন্য জমিদার, শ্রমিক, প্রজা, মালিক তথা সকল শ্রেণীর লোককে এতে যোগদানের আহ্বান জানান। বিবাদমান মুসলিম দলগুলোকেও কলহ পরিহার করে এতে যোগদানের জন্য তিনি অনুরোধ করেন। কৃষক প্রজা-পার্টির সাথেও এ দল আপোষ করতে প্রস্তুত ছিল। যদিও নেতৃত্বের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি। প্রায় একই সময় কলকাতায় ডা. রফি আহম্মদ, হাসান ইস্পাহানী প্রমুখ 'নিউ মুসলিম মজলিশ' নামে আরেকটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। পরে অবশ্য এ দুটি দল মুসলিম লীগের সাথে একত্রিত হলে মুসলিম লীগ পুনর্গঠিত হয়।

১.৪ পুনর্গঠিত মুসলিম লীগ

জিন্নাহ্র লন্ডনে স্বেচ্ছা নির্বাসন, সংকীর্ণ দলাদলি ও উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে বিংশ শতাব্দীর ত্রিশ-এর দশকের শুরুতে মুসলিম লীগ দুর্বল ও মৃত প্রায় একটি সংগঠনে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু ১৯৩৪ সালের শেষ দিকে জিন্নাহ দেশে ফিরে এসে এর স্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত হন এবং এর পুনর্গঠন কাজ শুরু করেন। ১৯৩৭ সালের নির্বাচন সামনে রেখে তিনি মুসলিম লীগের পক্ষে প্রচারণার জন্য ভারতের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সবগুলো প্রদেশ সফর করেন। ১৯৩৬ সালে তিনি কলকাতায়

আসেন এবং মুসলিম নেতৃত্বাধীন দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেন। ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি, নিউ মুসলিম মজলিশ এবং কৃষক-প্রজা পার্টির সাথে আলোচনা করে আসন্ন নির্বাচনে মুসলিম লীগের অধীনে নির্বাচনের প্রস্তাব দেন। ফজলুল হকের ব্যক্তিগত সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কৃষক-প্রজা পার্টি ঐক্যবদ্ধ নির্বাচন প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারেনি। কেননা কৃষক-প্রজা পার্টির অন্যতম নির্বাচনী ইশতেহার ছিল 'বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ'। কিন্তু ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি ও মুসলিম লীগের অভিজাত ভূস্বামী শ্রেণী এ দাবি মেনে নিতে রাজি না হওয়ায় প্রজা-পার্টি তাদের নিজেদের স্বতন্ত্র ইস্যু নিয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সিদ্ধান্ত নেয়। এমতাবস্থায় ইউনাইটেড মুসলিম পার্টির সমন্বয়ে পুনর্গঠিত মুসলিম লীগ স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচনে অংশ নেয়।

১.৫ ১৯৩৭ সালের নির্বাচন ও এর ফলাফল

১৯৩৭ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই ভারতের জন্য অধিকতর রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সংস্কার দাবি করে নির্বাচনী প্রচারণায় অবতীর্ণ হয়। অন্যদিকে কৃষক-প্রজা পার্টি কৃষকদের দুর্দশা অবসানের জন্য জমিদারি প্রথার অবসানসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করে। ফলে কৃষক-প্রজা পার্টির কর্মসূচি সহজেই গ্রামীণ সাধারণ জনমানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। ফজলুল হকের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তাও কৃষক-প্রজা পার্টির প্রতি জনসমর্থন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদের মোট আসন সংখ্যা ছিল ২৫০টি। তন্মধ্যে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ছিল ১২১টি আসন। সংরক্ষিত এ আসনগুলোর জন্য বাংলার মানুষ প্রধান দুটো দলে বিভক্ত হয়। একদিকে অসাম্প্রদায়িক কৃষক-প্রজা পার্টি এবং অন্যদিকে মধ্যবিত্ত ও অভিজাতদের সংগঠন মুসলিম লীগ। নির্বাচনে উভয় দলের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা হয়। নির্বাচনের ফলাফল ছিল নিম্নরূপ :

ক্রমিকনং	রাজনৈতিক দল	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা
১.	কৃষক-প্রজা পার্টি	৩৮
২.	মুসলিম লীগ	৪০
৩.	নির্দলীয় মুসলমান	৪১
৪.	কংগ্রেস	৬০
৫.	ইউরোপীয়	২৫
৬.	নিদর্লীয় নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু	২৩
৭.	নিদর্লীয় বর্ণ হিন্দু	১৪
৮.	নিদর্লীয় অতিরিক্ত	১২

উল্লেখ্য যে, স্বতন্ত্র সদস্যদের অধিকাংশ মুসলিম লীগে এবং কিছু সংখ্যক কৃষক-প্রজা পার্টিতে যোগ দেওয়ায় শেষ পর্যন্ত মুসলিম লীগের সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৯ এবং কৃষক-প্রজা পার্টি ৫৫ তে।

১.৬ গুরুত্ব ও তাৎপর্য

১৯৩৭ সালের নির্বাচনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। এই নির্বাচনে মুসলিম লীগ বিরাট সাফল্য লাভ করে। যদিও পাঞ্জাব এবং সিন্ধুতে তাদের এত সাফল্য অর্জিত হয়নি। বাংলায় তাদের এ সাফল্যের কারণ ছিল—

ক. মুসলিম লীগের প্রার্থীদের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা।
খ. নির্বাচনী প্রচারণার জন্য নিজস্ব তহবিল।
গ. দৈনিক আজাদ ও স্টার অব ইন্ডিয়ার মতো জনপ্রিয় পত্রিকাগুলোর মুসলিম লীগের পক্ষে প্রচারণা।
ঘ. শিক্ষিত সচেতন মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও ছাত্র সমাজের মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মুসলিম লীগকে সমর্থন দান, এবং
ঙ. সোহরাওয়ার্দীর ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা ইত্যাদি।

তবে নির্বাচনে মুসলিম লীগের এ সাফল্য কিছুটা হলেও ম্লান হয়েছিল দলের প্রভাবশালী নেতা খাজা নাজিম উদ্দিনের নিজ জমিদারি পটুয়াখালীতে শোচনীয় পরাজয়। কৃষক-প্রজা পার্টির এ. কে. ফজলুল হক তাঁকে বিপুল ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন। নাজিম উদ্দিনের এ পরাজয় ফজলুল হকের গ্রাম বাংলায় বিপুল জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে। কৃষক-প্রজা পার্টির প্রতিনিধিগণও সাধারণ মানুষের আস্থা লাভ করেছিল। তাদের ঘোষিত 'ডাল-ভাত' কর্মসূচি ছিল মূলত দরিদ্র জনগোষ্ঠীরই

কর্মসূচি। এ নির্বাচনে আরেকটি লক্ষণীয় ব্যাপার হলো মুসলিম রাজনীতিতে অভিজাত শ্রেণীর প্রভাব হ্রাস এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা লাভ।

সার-সংক্ষেপ

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে ১৯৩৭ সালে ভারতে প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গীয় কৃষক-প্রজা পার্টি প্রধান দল হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। নির্বাচনে মুসলিম সংরক্ষিত আসনসমূহে কৃষক-প্রজা পার্টি ও মুসলিম লীগের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় এবং উভয় দল প্রায় সমসংখ্যক আসন লাভ করে। এ নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলার রাজনীতিতে মধ্যবিত্ত মুসলমান নেতাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৪.১

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন :

১. ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে ফজলুল হক যে দলের প্রধান ছিলেন—

ক. কৃষক-শ্রমিক পার্টি
খ. কৃষক-প্রজা পার্টি
গ. গণতন্ত্রী পার্টি
ঘ. মুসলিম লীগ

২. ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে ফজলুল হকের নিকট পরাজিত হন মুসলিম লীগের প্রভাবশালী নেতা—

ক. মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ
খ. শহীদ সোহরাওয়ার্দী
গ. খাজা নাজিম উদ্দিন
ঘ. মাওলানা আকরম খাঁ

৩. ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রাপ্ত আসন সংখ্যা—

ক. ৩৮ টি
খ. ৬০ টি
গ. ৫০ টি
ঘ. ৫৫ টি

খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. কৃষক-প্রজা পার্টি ____________________ ইশতেহার প্রকাশ করে।
২. ১৯৩৫ সালের আইন অনুসারে _________ সালে ভারতে _____________ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন

১. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ১৯৩৭ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
২. ১৯৩৭ সালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় ঘটে।

ঘ. এক কথায় উত্তর দিন

১. ১৯৩৬ সালে নবাব হাবিবুল্লাহ প্রমুখের নেতৃত্বে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের নাম কি?
২. ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদের আসন সংখ্যা কত ছিল?

ঙ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ১৯৩৭ সালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
২. ১৯৩৭ সালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক নির্বাচনের ফলাফলের বর্ণনা দিন ।

পাঠ-২ : বঙ্গীয় মন্ত্রীসভা (১৯৩৭-১৯৪৭)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি -

☞ ১৯৩৭-১৯৪৭ সালের মধ্যে বঙ্গীয় মন্ত্রীসভাসমূহের গঠন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

☞ বিভিন্ন মন্ত্রীসভার কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবেন।

☞ বঙ্গীয় রাজনীতিতে মন্ত্রীসভার কার্যাবলির প্রভাব প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ সাল বাংলার রাজনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ সময় বাংলার রাজনীতিতে মুসলমানদের উত্থান ঘটে, হিন্দুদের কাছ থেকে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের নিয়ন্ত্রণ মুসলমানদের হাতে চলে আসে। আলোচ্য কালপর্বে বাংলায় চারটি মন্ত্রীসভা ক্ষমতাসীন হয়- ক. ফজলুল হকের প্রথম মন্ত্রীসভা (১৯৩৭-১৯৪১), খ. ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রীসভা (১৯৪১-১৯৪৩), গ. নাজিম উদ্দিন মন্ত্রীসভা (১৯৪৩-১৯৪৫) এবং ঘ. সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রীসভা (১৯৪৬-১৯৪৭)। নিম্নে উক্ত মন্ত্রীসভাসমূহের গঠন, কার্যাবলি ও বাংলার রাজনীতিতে এর প্রভাব প্রতিক্রিয়া আলোচনা করা হলো।

২.১ ফজলুল হকের প্রথম মন্ত্রীসভা (১৯৩৭-১৯৪১)

মন্ত্রীসভার গঠন

পূর্ববর্তী পাঠের আলোচনায় দেখা যায় যে, ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কোন দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি। ফলে বাংলায় কোয়ালিশন সরকার গঠন অনিবার্য হয়ে পড়ে। নির্বাচনী ফলাফলে দেখা যায় যে, কৃষক-প্রজা পার্টি মুসলিম লীগ ও স্বতন্ত্র মুসলিম সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় কাছাকাছি। তবে বাংলায় ফজলুল হকের ব্যক্তিগত গ্রহণযোগ্যতা ও প্রজা আন্দোলনের শক্তি ইত্যাদি বিবেচনায় বাংলার গভর্নর ফজলুল হককে মন্ত্রীসভা গঠনের আমন্ত্রণ জানান। বাংলার মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য মুসলমান সদস্যদের ঐক্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রবল জনমত থাকলেও ফজলুল হক প্রথমে কংগ্রেসের সাথে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠনের প্রস্তাব দেন। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্ব কৃষক-প্রজা পার্টির সাথে মন্ত্রীসভা গঠনে অসম্মতি জ্ঞাপন করে। এমতাবস্থায় কাল বিলম্ব না করে মুসলিম লীগ ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন একটি মন্ত্রীসভা গঠনে তাদের সম্মতির কথা জানালে ফজলুল হক ও তার দল কৃষক-প্রজা পার্টি এ প্রস্তাব গ্রহণ করে। প্রায় তিন সপ্তাহ সময় নিয়ে ফজলুল হক ১১ সদস্যের একটি মন্ত্রীপরিষদ গঠন করেন। মন্ত্রীসভা ছিল নিম্নরূপ :

নাম	রাজনৈতিক সংগঠন	দপ্তর
১. এ. কে. ফজলুল হক	কৃষক-প্রজা পার্টি	মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়
২. খাজা নাজিম উদ্দিন	মুসলিম লীগ	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৩. নবাব খাজা হাবিবুল্লাহ	মুসলিম লীগ	কৃষি ও শিল্প মন্ত্রণালয়
৪. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী	মুসলিম লীগ	বাণিজ্য ও শ্রম মন্ত্রণালয়
৫. সৈয়দ নওশের আলী	কৃষক-প্রজা পার্টি	জনস্বাস্থ্য ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়
৬. নবাব মোশাররফ হোসেন	স্বতন্ত্র মুসলিম	বিচার ও আইন মন্ত্রণালয়
৭. নলিনী রঞ্জন সরকার	বর্ণ হিন্দু	অর্থ মন্ত্রণালয়
৮. বিজয় প্রসাদ সিংহ রায়	বর্ণ হিন্দু	রাজস্ব মন্ত্রণালয়
৯. মহারাজা শশী চন্দ্র নন্দী	বর্ণ হিন্দু	যোগাযোগ ও পূর্ত মন্ত্রণালয়
১০. প্রসন্নদেব রাইকত	তফসিলী হিন্দু	শুল্ক ও বন মন্ত্রণালয়
১১. মুকুন্দ বিহারী মল্লিক	তফসিলী হিন্দু	সমবায়, ঋণ ও পল্লী-দারিদ্র্য মন্ত্রণালয়

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কংগ্রেস মন্ত্রীসভায় যোগদান করেনি। ১১ সদস্যের মন্ত্রীসভায় ৬ জন ছিলেন মুসলমান। তন্মধ্যে কৃষক-প্রজা পার্টির ছিলেন মাত্র ২ জন। এ নিয়ে কৃষক-প্রজা পার্টিতে প্রথমে অসন্তোষ এবং পরে প্রকাশ্যে বিভক্তি দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত কৃষক-প্রজা পার্টির সংসদীয় শাখা এবং মূল সংগঠন দুটোই আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। ফলে সম্মিলিত মন্ত্রীসভাও দুর্বল হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় মন্ত্রীসভার স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য ফজলুল হক ১৯৩৭ সালের ১৫ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে মুসলিম লীগে যোগ দেন। তিনি প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি এবং সোহরাওয়ার্দী সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

হক মন্ত্রীসভার কার্যকাল

মুসলিম লীগের সাথে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠন করায় ফজলুল হককে কৃষক-প্রজা পার্টির অন্যতম কর্মসূচি 'বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি উচ্ছেদ' সহ কিছু বিষয়ে ছাড় দিতে হয়। এ বিষয়ে ১৯৩৮ সালে 'ফ্লাউড কমিশন' নামে একটি কমিশন গঠিত হলেও দেশ বিভাগের পূর্বে কোন সরকারই জমিদারি প্রথা উচ্ছেদে কোন কার্যকর ভূমিকা নিতে পারেনি। আসলে এ মন্ত্রীসভাকে বহু সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ করতে হয়েছিল। তথাপি কৃষক ও বাঙালি শিক্ষিত মুসলমানদের স্বার্থে হক মন্ত্রীসভা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জমিদারদের ক্ষমতা হ্রাস ও কৃষকদের অধিকার বৃদ্ধি এবং কৃষকদের করভার লাঘবের জন্য এ মন্ত্রীসভার উদ্যোগে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব (সংশোধন) আইন (১৯৩৮) এবং কৃষিখাত আইন (১৯৩৮) পাস করা হয়। এই সময় ঋণ শালিসি বোর্ড গঠন করে কৃষকদের ঋণভার লাঘবের চেষ্টা করা হয়। ১৯৩৯ সালে বঙ্গীয় চাকরি নিয়োগ বিধি প্রবর্তন করে মুসলমানদের জন্য শতকরা ৫০ ভাগ চাকরি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৪০ সালে মহাজনী আইনের মাধ্যমে মহাজনদের লাইসেন্স প্রথা প্রবর্তন এবং সুদের হার নির্দিষ্ট করা হয়। এ ছাড়াও রাজবন্দিদের মুক্তি, হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণসহ হক মন্ত্রীসভা আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পন্ন করে।

বাংলার রাজনীতিতে প্রভাব

নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও হক মন্ত্রীসভা কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কল্যাণমূলক পদক্ষেপ বাংলার মুসলিম জনমতকে প্রভাবিত করে। তবে এ কৃতিত্বের সুফল মুসলিম লীগের পক্ষে যায়। সংগঠনগতভাবে মুসলিম লীগও এ কৃতিত্বকে পুরোপুরি নিজ স্বার্থে ব্যবহার করে। ফলে মুসলিম লীগের গুরুত্ব ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তাকে আরো বৃদ্ধি করে এবং এর অগ্রগতি হয়ে ওঠে অপ্রতিরোধ্য।

প্রথম হক মন্ত্রীসভার পতন

মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সাথে বিশেষ করে জিন্নাহর সাথে ফজলুল হকের মতবিরোধ ১৯৪০ সাল থেকেই শুরু হয়। প্রাদেশিক ব্যাপারে জিন্নাহর অযাচিত হস্তক্ষেপ ছাড়াও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশদের সহযোগিতার নীতির প্রশ্নে মতবিরোধ তীব্র হয়। জিন্নাহ ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধনীতির সমর্থন বিরোধী। ১৯৪১ সালে ব্রিটিশ সরকার 'জাতীয় প্রতিরক্ষা কাউন্সিল' গঠন করে ফজলুল হকসহ মুসলিম লীগের তিন প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রীর নাম এতে যুক্ত করে। জিন্নাহ এক্ষেত্রে তিন প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রীকে কাউন্সিল হতে পদত্যাগের নির্দেশ দেন। পাঞ্জাব ও আসামের মুখ্যমন্ত্রী জিন্নাহর নির্দেশ অনুযায়ী পদত্যাগ করলেও ফজলুল হক অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। এতে মতবিরোধ চরম আকার ধারণ করে। এ সময় সোহরাওয়ার্দী ও অন্যান্য মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের সাথেও ফজলুল হকের তীব্র মতবিরোধ দেখা দেয়। এমতাবস্থায় ফজলুল হক মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটি ও কাউন্সিল হতে পদত্যাগ করেন। ১৯৪১ সালের ১ ডিসেম্বর তিনি মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকেও পদত্যাগ করেন। ফলে প্রথম হক মন্ত্রীসভার পতন ঘটে।

২.২ ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রীসভা (১৯৪১-১৯৪৩)

প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টি গঠন

জিন্নাহ ও মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় ও অবাঙালি প্রাদেশিক নেতৃত্বের সাথে চরম মতবিরোধের পটভূমিতে ফজলুল হকের প্রথম মন্ত্রীসভার পতন ঘটে। এরপর ফজলুল হক তাঁর অনুসারীদের নিয়ে ফরওয়ার্ড ব্লক, কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা, ইন্ডিপেন্ডেন্ট তফসিলি হিন্দু এবং কৃষক-প্রজা পার্টির সমন্বয়ে 'প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টি' নামে একটি নতুন সম্মিলিত দল গঠন করেন। এ দলের উদ্দেশ্য ছিল সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান ও বাংলার হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে স্থায়ী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা।

দ্বিতীয় হক মন্ত্রীসভা গঠন

আইন সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের ফজলুল হকের প্রতি সমর্থন থাকায় ১৯৪১ সালের ১০ ডিসেম্বর বাংলার গভর্নর ফজলুল হককে নতুন মন্ত্রীসভা গঠনের আমন্ত্রণ জানান। ১১ ডিসেম্বর প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টির উপ নেতা শরৎ বসু গ্রেপ্তার হন। নতুন মন্ত্রীসভায় তাঁর অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি ছিল চূড়ান্ত। কিন্তু তার গ্রেপ্তারের ফলে তাকে বাদ দিয়েই ফজলুল হক ১১ সদস্যের একটি পূর্ণ মন্ত্রীসভা গঠন করেন। মন্ত্রীসভায় ৬ জন মুসলমান এবং ৫ জন হিন্দু সদস্য ছিলেন। হকের নতুন মন্ত্রীসভা পাঁচমিশালি দল নিয়ে গঠিত হয়। এ মন্ত্রীসভার অন্যতম সদস্য ছিলেন মুসলিম লীগের পক্ষ ত্যাগকারী খাজা হাবিবুল্লাহ,

কৃষক-প্রজা পার্টির একাংশের নেতা শামসুদ্দিন আহমদ এবং হিন্দু মহা সভার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। শ্যামাপ্রসাদকে অর্থ-মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়া

হকের দ্বিতীয় মন্ত্রীসভা ১৯৪৩ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। কংগ্রেস এ মন্ত্রীসভায় যোগ দেয়নি। এমনকি কংগ্রেসের হাইকমান্ড এ মন্ত্রীসভার ব্যাপারে কোন উৎসাহ দেখায়নি। প্রথম থেকেই মুসলিম লীগ এ মন্ত্রীসভাকে সুনজরে দেখেনি। মন্ত্রীসভায় মুসলিম বিদ্বেষী কট্টর সাম্প্রদায়িক হিন্দু মহাসভার ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর অন্তর্ভুক্তিকে পুঁজি করে মুসলিম লীগ এ মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে মুসলিম জনমত গঠনে তৎপর হয়। মুসলিম লীগের এ মন্ত্রীসভাকে 'শ্যামা-হক' মন্ত্রীসভা নামে আখ্যায়িত করে। সোহরাওয়ার্দী ও অন্যান্য মুসলিম লীগের নেতৃত্বে সারা বাংলায় ব্যাপক সফরের মাধ্যমে এ মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচারণা চালায়। ফলে হক মন্ত্রীসভা মুসলিম জনমনে বিশেষ করে মধ্য শ্রেণী ও ছাত্রদের আস্থা হারায় এবং ক্রমশ অপ্রিয় হয়ে ওঠে।

মন্ত্রীসভার কতিপয় পদক্ষেপ ও এর প্রতিক্রিয়া

দ্বিতীয় হক মন্ত্রীসভার কতগুলো পদক্ষেপ জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। মন্ত্রীসভার জন্য এর পরিণতি মারাত্মক হয়েছিল। মন্ত্রীসভা কর্তৃক রাজনৈতিক তৎপরতা রোধে 'জরুরি বিধি' প্রবর্তন, মাধ্যমিক শিক্ষা বিল স্থগিতকরণ, সিভিল ডিফেন্স বিভাগে হিন্দুদের অধিকহারে চাকরি প্রদান, কিশোরগঞ্জ শহরে জামে মসজিদের সামনে হিন্দুদের গান-বাজনাকে কেন্দ্র করে দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং এতে পুলিশের গুলিতে কয়েকজন নিহত হওয়ায় উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সরকারের নিষ্ক্রিয়তা ইত্যাদি মুসলমানদের মনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার করে। ফলে হকের কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা মুসলিম সমাজে দারুণ অপ্রিয় হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় হক মন্ত্রীসভার পতন

১৯৪২ সালে গান্ধীর 'ভারত ছাড় আন্দোলন'কে কেন্দ্র করে বাংলায় ব্যাপক গণ বিক্ষোভ দেখা দেয়। এর কিছুদিন আগে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর রহস্যজনক অন্তর্ধান এবং তাঁর 'আজাদ হিন্দু ফৌজের' তৎপরতা বাংলায় অস্থির অবস্থা সৃষ্টি করে। বাংলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে। এ সময় মেদিনীপুরে কংগ্রেস সমর্থকদের উপর পুলিশী নির্যাতনের প্রতিবাদে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন। বাংলায় তখন দারুণ খাদ্য সংকট দেখা দেয়। এ সংকট মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়ে ফজলুল হক পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। ফলে দ্বিতীয় হক মন্ত্রীসভার পতন ঘটে।

২.৩ নাজিম উদ্দিন মন্ত্রীসভা (১৯৪৩-১৯৪৫)

ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রীসভার পতনের পর গভর্নর হার্বার্ট মুসলিম লীগ সংসদীয় দলের নেতা স্যার খাজা নাজিম উদ্দিনকে মন্ত্রীসভা গঠনের আমন্ত্রণ জানান। ২৪ এপ্রিল তিনি ১৩ সদস্যের একটি মন্ত্রীসভা গঠন করেন। এ মন্ত্রীসভায় ৭ জন মুসলমান এবং ৬ জন হিন্দু (৩ জন বর্ণ হিন্দু এবং ৩ জন তফসিলি হিন্দু) সদস্য ছিলেন। কংগ্রেস এ মন্ত্রীসভায়ও যোগ দেয়নি। মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিন ছাড়াও মন্ত্রীসভার সদস্যদের মধ্যে খাজা শাহাব উদ্দিন, তমিজ উদ্দিন খান, নবাব মোশাররফ হোসেন, পুলিন বিহারী মল্লিক প্রমুখ ছিলেন অন্যতম। এ মন্ত্রীসভায় সোহরাওয়ার্দী বেসামরিক সরবরাহ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ

নাজিম উদ্দিনের নেতৃত্বে গঠিত মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই বাংলায় ১৯৪৩ সালে এক ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। প্রকৃতপক্ষে ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রীসভার শাসনামালেই বাংলায় খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছিল। নাজিম উদ্দিন মন্ত্রীসভা গঠনের পর এ সংকট আরো তীব্র হয়। এ খাদ্য সংকটের পিছনে বেশ কিছু কারণ ছিল। যথা—

ক. ব্রহ্মদেশ হতে চাল আমদানি বন্ধ হওয়া। বস্তুত জাপান কর্তৃক ব্রহ্মদেশ দখল হওয়ায় চাল আমদানি বন্ধ হয়ে যায়।
খ. অনাবৃষ্টির ফলে দেশে খাদ্য উৎপাদন হ্রাস।
গ. সেনাবাহিনীর জন্য সরকারের খাদ্যশস্য সংরক্ষণ নীতি এবং
ঘ. মুনাফা লোভী অসাধু ব্যবসায়ীদের মুজদদারী ইত্যাদি।

উপরোক্ত পরিস্থিতিতে কর্ডনিং প্রথার কারণে সরকার অন্যান্য প্রদেশ হতে খাদ্য আমদানি করতে ব্যর্থ হয়। ফলে দুর্ভিক্ষ মারাত্মক আকার ধারণ করে এবং এতে ৩০ লক্ষাধিক লোক প্রাণ হারায়। দুর্ভিক্ষের হাত থেকে রক্ষার জন্য সোহরাওয়ার্দী

নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সরকারি উদ্যোগে বহু লঙ্গরখানা খোলা হয়। কলকাতা ও অন্যান্য শহরে রেশনিং প্রথা চালু করাসহ নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ফলে শেষ পর্যন্ত দুর্ভিক্ষের তীব্রতা হ্রাস পায়।

নাজিম উদ্দিন মন্ত্রীসভার পতন

বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ মোকাবিলা ছাড়া নাজিম উদ্দিন মন্ত্রীসভা তার দুবছরের শাসনামলে উল্লেখযোগ্য তেমন কোন সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। এ মন্ত্রীসভা মাধ্যমিক শিক্ষা সংক্রান্ত বিলটি হিন্দুদের বিরোধিতার কারণে পুনরায় পাস করাতে ব্যর্থ হয়। এ সময় মন্ত্রীসভার সদস্যদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির নানা অভিযোগ উত্থাপিত হয়। এমনকি মুসলিম লীগের অভ্যন্তরেই মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। নাজিম উদ্দিন মন্ত্রীসভার নৈতিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। এ সময় মুসলিম সমাজে পাকিস্তান আন্দোলনের ব্যাপক জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে হিন্দুরাও মন্ত্রীসভার প্রতি তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নিতে থাকে। এমত পরিস্থিতিতে ১৯৪৫ সালের ২৮ মার্চ বাজেট বরাদ্দের উপর ভোটাভোটির সময় ২০ জন সরকার সমর্থক সদস্য বিরোধী শিবিরে যোগ দেয়। ফলে পরিষদে ১০৬-৯৭ ভোটে নাজিম উদ্দিন মন্ত্রীসভার পতন ঘটে।

২.৪ সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রীসভা (১৯৪৬-১৯৪৭)

১৯৪৬ সালের নির্বাচন

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে ব্রিটেনে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে শ্রমিক দল জয়লাভ করে। ইংল্যান্ডের নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৪৬ সালে ভারতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলার ইতিহাসে এ নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ নির্বাচনে মুসলিম লীগ বিপুল বিজয় অর্জন করে। মুসলিম লীগ বাংলার রাজনীতিতে মুসলমানদের জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম নির্বাচনে মুসলিম লীগকে সমর্থন দেয়। মুসলিম লীগ হারিকেন প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে অংশ নেয় এবং বঙ্গীয় আইন সভার ১২১ টি সংরক্ষিত মুসলিম আসনের ১১৪ টি আসনে জয়লাভ করে। এ. কে. ফজলুল হক মৃতপ্রায় কৃষক-প্রজা পার্টিকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তিনি নিজে এবং অপর তিনজন সহযোগী ছাড়া কৃষক-প্রজা পার্টির আর কেউ নির্বাচনে জয়লাভ করতে পারেনি।

সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে মন্ত্রীসভা গঠন

১৯৪৬ সালের ২৪ এপ্রিল মুসলিম লীগ নেতা সোওয়াওয়ার্দী ৮ সদস্যের একটি মন্ত্রীসভা গঠন করেন। এ ৮ জন সদস্যের মধ্যে ৭ জন ছিলেন মুসলিম লীগ দলীয় এবং ১ জন তফসিলি হিন্দু। নভেম্বর মাসে অবশ্য মন্ত্রীসভা সম্প্রসারণ করা হয়েছিল।

সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রীসভার কার্যক্রম

সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রীসভা ১৫ মাস ক্ষমতায় ছিল। এসময়ে তাদের পক্ষে উল্লেখযোগ্য কোন আইনগত বিধান রচনা করা সম্ভব হয়নি। ভাগ চাষীদের 'তেভাগা আন্দোলন'কে সমর্থন করার জন্য বঙ্গীয় বর্গাদার নিয়ন্ত্রণ বিল আইন সভায় উত্থাপিত হলেও মুসলিম লীগের জোতদার সদস্যদের বিরোধিতায় তা ব্যর্থ হয়। জমিদারি বাতিল সংক্রান্ত 'ফ্লাউড কমিশন' রিপোর্টটি ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে আইন সভায় তোলা হলেও বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে তা আইনে পরিণত হতে পারেনি।

সোহরাওয়ার্দীর মন্ত্রীসভার পতন

প্রকৃতপক্ষে সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রীসভার কার্যকাল ছিল বাংলা ও ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের ক্রান্তিকাল। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান, দেশ বিভাগ ও পাকিস্তান সৃষ্টিকে কেন্দ্র করে এই অধ্যায়ের রাজনীতি আবর্তিত হয়। এই সময় 'কলকাতায় ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং এ দাঙ্গা রোধে সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রীসভার ব্যর্থতা, স্বাধীন অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ইত্যাদি ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাংলার রাজনীতিতে সোহরাওয়ার্দীর অবস্থান প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। এ অবস্থায় বাংলার মুসলিম লীগের সংসদীয় নেতা নির্বাচনের জন্য ১৯৪৭ সালের ৫ আগস্ট যে ভোট হয় তাতে সোহরাওয়ার্দী খাজা নাজিম উদ্দিনের কাছে ৭৫-৩৯ ভোটে পরাজিত হন।

সার-সংক্ষেপ

১৯৩৭-১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়কাল বাংলার রাজনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক অধ্যায়। এ সময় বাংলার রাজনীতিতে মুসলমানদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কালপর্বে চারটি মন্ত্রীসভা বাংলায় ক্ষমতাসীন হয়। তবে এ চারটি মন্ত্রীসভার মধ্যে ফজলুল হকের প্রথম মন্ত্রীসভা ছাড়া অন্য কোন মন্ত্রীসভা তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ও যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করতে পারেনি। বস্তুত এ কালপর্বটি বঙ্গ-ভারতের রাজনীতির একটি চূড়ান্ত ক্রান্তিকাল। এ সময় বাংলার ক্ষমতাসীন মন্ত্রীসভাগুলোকে উদ্ভূত রাজনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবেলা করে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে নিয়োজিত হতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৪.২

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন :

১. ঋণ সালিসি বোর্ড গঠন করেন—
   ক. শেখ মুজিবুর রহমান খ. এ. কে. ফজলুল হক
   গ. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘ. শামসুদ্দীন আহমদ

২. শাম্যাপ্রসাদ মুখার্জীর রাজনৈতিক দলের নাম—
   ক. হিন্দু মহাসভা খ. কৃষক-প্রজা পার্টি
   গ. ভারতীয় কংগ্রেস ঘ. ফরওয়ার্ড ব্লক

৩. বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল—
   ক. ১৯৪০ সালে খ. ১৯৪২ সালে
   গ. ১৯৪৩ সালে ঘ. ১৯৪৪ সালে

৪. সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রীসভার শাসনকাল ছিল—
   ক. ২৩ মাস খ. ১৭ মাস
   গ. ১৩ মাস ঘ. ১৫ মাস

খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. এ. কে. ফজলুল হক ১৯৩৭ সালের ১৫ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে ______ যোগদান করেন।
২. ১৯৪৬ সালের ২৪ এপ্রিল মুসলিম লীগ নেতা _____ নেতৃত্বে ৮ সদস্যের মন্ত্রীসভা গঠিত হয়।

গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন

১. ১৯৩৭ সালে ফজলুল হক কংগ্রেসের সাথে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠন করেন।
২. নাজিম উদ্দিন মন্ত্রীসভার শাসনামলে ১৯৪৩ সালে বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।

ঘ. এক কথায় উত্তর দিন

১. প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টির প্রতিষ্ঠাতা কে?
২. ১৯৪৬ সালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগ কয়টি আসন লাভ করেছিল?

ঙ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. প্রথম হক মন্ত্রীসভার কার্যক্রম সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
২. ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের প্রকৃতি আলোচনা করুন।
৩. ১৯৩৭ - ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ৪ টি বঙ্গীয় মন্ত্রীসভার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

পাঠ-৩ : লাহোর প্রস্তাব (১৯৪০)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি -

☞ ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের পটভূমি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

☞ লাহোর প্রস্তাবের মূল বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

☞ লাহোর প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

লাহোর প্রস্তাব ব্রিটিশ ভারতের মুসলমানদের রাজনৈতিক ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কেননা এ ঐতিহাসিক প্রস্তাব গ্রহণের পর মুসলমানদের রাজনৈতিক চিন্তাধারায় যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে তার স্বার্থক পরিণতি পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা এবং পরে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়।

৩.১ লাহোর প্রস্তাবের পটভূমি

লক্ষ্মৌ চুক্তি এবং পরবর্তীতে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন ভারতের হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সেতুবন্ধন রচনা করে। তবে আইন সভায় মুসলমানদের জন্য আসন সংরক্ষণ ও স্বতন্ত্র নির্বাচন অধিকার প্রশ্নে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ পুনরায় মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। বিশ শতকের তৃতীয় দশকে সমস্যা অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করে। এ শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে কয়েকটি উদ্যোগ ব্যর্থ হয়। অবশেষে ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রণয়ন করে। এ আইন ভারতীয়দের সন্তুষ্ট করতে পারেনি। তবে এ আইনের আওতায় প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন কার্যকর করার জন্য ১৯৩৭ সালে যে প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাতে প্রায় সকল রাজনৈতিক দল অংশ নেয়। প্রাদেশিক নির্বাচনে অধিকাংশ প্রদেশে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম প্রদেশসমূহেও মুসলিম লীগ পরাজিত হয়। এমতাবস্থায় মুসলিম লীগ কংগ্রেসের সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠনের প্রস্তাব করলে কংগ্রেস তা প্রত্যাখ্যান করে। এমনকি মুসলিম লীগের সাথে কোনরূপ আলাপ-আলোচনা ছাড়াই কংগ্রেস মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহ মন্ত্রীসভা গঠন করে। কংগ্রেস শাসিত প্রদেশসমূহে মুসলিম বিদ্বেষী কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। ‘বন্দেমাতারাম’কে জাতীয় সংগীত হিসেবে প্রবর্তনের চেষ্টা, স্কুলসমূহের পাঠ্যসূচিতে হিন্দু ধর্ম-দর্শন ও সাহিত্যকে বাধ্যতামূলককরণ, আযান নিষিদ্ধকরণ, নামাজের সময় মসজিদের সামনে দিয়ে বাধ্যযন্ত্রসহ মিছিল এবং সরকারি ভবনসমূহে কংগ্রেসের পতাকা উত্তোলন ইত্যাদি মুসলিম অনুভূতিকে আহত করে। তদুপরি কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল নেহেরু কর্তৃক ভারতে কেবল দুটি শক্তির- ব্রিটিশ সরকার এবং কংগ্রেসের অস্তিত্ব সংক্রান্ত ঘোষণা মুসলমানদের দারুণভাবে বিক্ষুব্ধ করে। জিন্নাহ (যিনি এক সময় হিন্দু-মুসলিম মিলনের প্রবক্তা ছিলেন) নেহেরুর বক্তব্যের প্রতিবাদে তাঁর বিখ্যাত ‘দ্বি-জাতিতত্ত্ব’ ঘোষণা করেন। দ্বি-জাতিতত্ত্ব মতে, ভারতে হিন্দু-মুসলিম দুটি আলাদা জাতি। তাদের ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পূর্ণ আলাদা। সুতরাং সাম্প্রদায়িক জটিলতা নিরসনে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন অপরিহার্য।

অবশ্য মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের দাবি প্রথম উত্থাপন করেন আল্লামা ইকবাল ১৯৩০ সালে। ১৯৩৩ সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঞ্জাবি ছাত্র চৌধুরী রহমত আলী ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে ‘পাকিস্তান’ নামক পৃথক রাষ্ট্র গঠনের প্রাস্তব করেন। ১৯৩৯ সালে জিন্নাহ পুনরায় মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেন।

৩.২ লাহোর প্রস্তাব গ্রহণ ও এর মূল বক্তব্য

১৯৪০ সালের মার্চ মাসে লাহোরে মুসলিম লীগের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির বক্তৃতায় জিন্নাহ তাঁর দ্বি-জাতিতত্ত্ব ও মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমির যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। অতঃপর ২৩ মার্চ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক একটি প্রস্তাব পেশ করেন- যা ঐতিহাসিক ‘লাহোর প্রস্তাব’ নামে পরিচিত। এই প্রস্তাবের মূল বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ—

- ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করতে হবে।
- পূর্বোক্ত স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের প্রদেশগুলো হবে স্বশাসিত ও সার্বভৌম।

- সর্বক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের বিভিন্ন স্বার্থ ও অধিকার রক্ষাকল্পে সংবিধানে প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত রক্ষাকবচের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

২৪ মার্চ প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে মুসলিম লীগ অধিবেশনে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

৩.৩ লাহোর প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া

লাহোর প্রস্তাবের প্রতি হিন্দু ও কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া ছিল তীব্র। কংগ্রেস নেতা নেহেরু ও গান্ধী উভয়েই এ প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন। গান্ধী তাঁর লেখায় লাহোর প্রস্তাবের সমালোচনা করেন এবং ভারত বিভাগকে পাপের সমতুল্য বলে মন্তব্য করেন। নেহেরু মুসলমানদের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা অবান্তর মন্তব্য করেন। হিন্দু সংবাদপত্র ও সাময়িকীসমূহ লাহোর প্রস্তাবকে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' হিসেবে আখ্যায়িত করে এর তীব্র সমালোচনা করে। যদিও মূল প্রস্তাবে 'পাকিস্তান' রাষ্ট্র গঠনের কথা উল্লেখ নেই। সেখানে স্টেটস (States) গঠনের কথা বলা হয়েছে। তবে ক্রমান্বয়ে মুসলমানদের মধ্যে এক রাষ্ট্রের ধারণা জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৯৪৬ সালের ৯ এপ্রিল দিল্লিতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ দলীয় আইন সভার সদস্যদের এক সম্মেলনে লাহোর প্রস্তাব সংশোধন করে এক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি করা হয়। এ দাবি অনুযায়ী ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহ নিয়ে একটি মাত্র মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করা হয়।

৩.৪ লাহোর প্রস্তাবের গুরুত্ব

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে লাহোর প্রস্তাবের গুরুত্ব অপরিসীম। এ প্রস্তাবের মাধ্যমে জিন্নাহর দ্বি-জাতিতত্ত্ব সুস্পষ্ট রূপ লাভ করে। মুসলমানরা মুসলিম লীগের নেতৃত্বে তাদের জন্য একটি পৃথক আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত হয়। দীর্ঘদিনের জটিল শাসনতান্ত্রিক ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের লক্ষে ব্রিটিশ সরকার ও মুসলমানদের দাবি মেনে নেয়। ফলে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র 'পাকিস্তানের' জন্ম হয়।

বাংলার যে মুসলমান সম্প্রদায় এতদিন পর্যন্ত নিজেদের আত্মপরিচয়ের সন্ধানে ছিল, তারা লাহোর প্রস্তাবে এর সন্ধান পায়। লাহোর প্রস্তাব তাদেরকে একটি জাতীয় চেতনা দান করে। ১৯৪৭ সালে পৃথক রাজনৈতিক অস্তিত্ব বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হলেও এ জাতীয় চেতনাই পরবর্তীকালে ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় প্রেরণা যোগায়।

সার-সংক্ষেপ

ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে লাহোর প্রস্তাব একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। ভারতের এক জটিল রাজনৈতিক সংকটকালে ১৯৪০ সালে এ. কে. ফজলুল হক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এতে ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অঞ্চলগুলো নিয়ে একাধিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়। কংগ্রেস ও হিন্দুদের বিরোধিতা সত্ত্বেও এ প্রস্তাবের আংশিক পরিবর্তন করে পরবর্তীতে ভারতে মুসলমানদের পৃথক আবাসভূমির স্বপ্ন পূরণ হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৪.৩

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন :

১. ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব পেশ করেন—
ক. মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ খ. এ. কে. ফজলুল হক
গ. খাজা নাজিম উদ্দিন ঘ. শহীদ সোহরাওয়ার্দী

২. লাহোর প্রস্তাব ছিল—
ক. স্বাধীন বাংলা গঠনের প্রস্তাব
খ. স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব
গ. মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে একাধিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব
ঘ. ভারতের স্বাধীনতার প্রস্তাব

৩. পাকিস্তান নামটির উদ্ভাবন করেন—
ক. মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ খ. আল্লামা ইকবাল
গ. এ. কে. ফজলুল হক ঘ. চৌধুরী রহমত আলী

খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. দ্বি-জাতিতত্ত্ব মতে ভারতে _____ দুটি আলাদা জাতি।
২. ____ সালের ____ মার্চ এ. কে. ফজলুল হক লাহোর প্রস্তাব পেশ করেন।

গ. সত্য হলে ‘স’ এবং মিথ্যা হলে ‘মি’ লিখুন

১. আল্লামা ইকবাল দ্বি-জাতিতত্ত্বের প্রবক্তা।
২. লাহোর প্রস্তাবে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অঞ্চল নিয়ে একাধিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়।

ঘ. এক কথায় উত্তর দিন

১. দ্বি-জাতিতত্ত্বের প্রবক্তা কে?
২. ভারত বিভাগকে পাপের সমতুল্য বলে কে মন্তব্য করেন?

ঙ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. লাহোর প্রস্তাবের মূল বক্তব্য কি?
২. লাহোর প্রস্তাবের গুরুত্ব ও ফলাফল আলোচনা করুন।

পাঠ-৪ : ক্রীপস প্রস্তাব ও পরবর্তী রাজনীতি (১৯৪২-৪৬ সাল)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি—

- ☞ ক্রীপস মিশনের আগমন ও এর প্রস্তাব সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- ☞ ক্রীপস প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ☞ ক্রীপস প্রস্তাব পরবর্তী ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত রাজনীতি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

৪.১ ক্রীপস প্রস্তাব (১৯৪২)

ক্রীপস মিশন আগমনের পটভূমি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর পরপরই ভারতে 'প্রতিরক্ষা আইন' পাসের প্রতিবাদে কংগ্রেস মন্ত্রীসভার পদত্যাগ, যুদ্ধে ব্রিটেনকে সর্বাত্মক সহায়তাদানে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে মতবিরোধ, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোসের জার্মানি গমন এবং 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি' গঠন ব্রিটিশ সরকারকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। এসময় ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশে নাজী আক্রমণ, দূরপ্রাচ্যে জাপানিদের বিজয় এবং তাদের হাতে মালয় ও বার্মার পতনের পর ব্রিটিশ সরকার বেকায়দায় পড়ে। তারা ভারতের নিরাপত্তা সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়ে। সর্বোপরি এসময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট, চীনের মার্শাল চিয়াং কাইশেক, অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রী মি. ইভাত ব্রিটিশ সরকার ও ভারতীয়দের মধ্যে রাজনৈতিক সমঝোতার জন্য চাপ দেয়।

ক্রীপস মিশনের আগমন ও প্রস্তাব পেশ

উপরোক্ত পরিস্থিতিতে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল ব্রিটিশ কমন্সসভার সদস্য এবং যুদ্ধ মন্ত্রীসভার অর্থমন্ত্রী স্যার স্ট্যাপোর্ড ক্রীপসকে ভারতে পাঠান। ক্রীপস ১৯৪২ সালের ২৩ মার্চ দিল্লিতে এসে পৌঁছান। তিনি কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সাথে আলোচনার পর একটি শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব পেশ করেন। ইতিহাসে এ প্রস্তাব 'ক্রীপস প্রস্তাব' নামে পরিচিত। ক্রীপস প্রস্তাবের শর্তাবলী ছিল নিম্নরূপ :

ক্রীপস প্রস্তাবের শর্তাবলি

ক. ক্রীপস প্রস্তাবে বলা হয় যে, যুদ্ধ শেষ হবার পর ভারতকে ডোমিনিয়ন বা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হবে।

খ. ভারতের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য একটি গণ-পরিষদ গঠন করা হবে।

গ. প্রদেশগুলো ইচ্ছা করলে নতুন শাসনতন্ত্র গ্রহণ করবে অথবা বর্তমান শাসনতান্ত্রিক কাঠামোই অক্ষুণ্ণ রাখবে।

ঘ. ক্রীপস প্রস্তাবে অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে একটি অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠনের কথা বলা হয়। তবে দেশরক্ষা ও প্রতিরক্ষা বিভাগে পূর্বের ন্যায় ব্রিটিশ সরকারের পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকবে বলে উল্লেখ করা হয়।

প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া

ক্রীপস প্রস্তাব কংগ্রেস, মুসলিম লীগ বা হিন্দু মহাসভাসহ ভারতের কোন রাজনৈতিক দলকেই সন্তুষ্ট করতে পারেনি। কংগ্রেসের দাবি ছিল অবিভক্ত ভারত। তারা মনে করে ক্রীপস প্রস্তাবের অনিবার্য ফলস্বরূপ ভারত হিন্দু ও মুসলমান শাসিত দুটি স্বতন্ত্র রাজ্যে বিভক্ত হবে। ক্রীপস প্রস্তাব পরোক্ষভাবে মুসলমানদের পৃথক রাষ্ট্র গঠনের মূলনীতি স্বীকার করলেও পরিকল্পনা কার্যকরের সুনির্দিষ্ট সময় উল্লেখসহ তাদের আরো কিছু দাবির স্বীকৃতি না থাকায় মুসলিম লীগও এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ফলে ক্রীপস প্রস্তাব ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

গুরুত্ব ও ফলাফল

ক্রীপস প্রস্তাবের নানা সীমাবদ্ধতা ছিল সন্দেহ নেই। তথাপি একথা বলা যায় যে, ভারতে এ যাবত উত্থাপিত যে কোন শাসনতান্ত্রিক ফরর্মূলার চেয়ে এটি ছিল অগ্রগামী। কেননা এ প্রস্তাবে ব্রিটিশ সরকার প্রথমবারের মতো ভারতের ডোমিনিয়ন মর্যাদার দাবি মেনে নেয়। ভারতীয়দের নিজস্ব সংবিধান প্রণয়নের অধিকার দেয় এবং এজন্য একটি গণপরিষদ গঠনের কাঠামো প্রদান করে। যদিও এসব ভারতীয়দের প্রত্যাশার তুলনায় নগণ্য ছিল। তাই শেষ পর্যন্ত এ প্রস্তাব ভারতীয়দের সন্তুষ্ট করতে পারেনি। ক্রীপস মিশন ব্যর্থ হয়।

৪.২ আগস্ট আন্দোলন

ক্রীপস মিশনের ব্যর্থতা গান্ধীর হাতকে শক্তিশালী করেছিল। এসময় জাপানিদের বার্মা দখলের পটভূমিতে গান্ধী ভারত থেকে ব্রিটিশ সৈন্য প্রত্যাহারের দাবি জানান। ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে ওয়ার্দ্ধায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভা থেকেও এই দাবি পুনর্ব্যক্ত করা হয়। ১৯৪২ সালের ৭ আগস্ট কংগ্রেস কমিটিতে ভাষণদানকালে গান্ধী বলেন, 'স্বাধীনতা আকাশ থেকে ঝরে পড়বে না-লড়াই করে আমাদের স্বাধীনতা আনতে হবে।' গান্ধীর এ বক্তব্যের পর তাঁর নেতৃত্বে কংগ্রেস 'ভারত ছাড়' দাবি ও ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন শুরু করে। ব্রিটিশ সরকার আন্দোলন দমনের জন্য বহু কংগ্রেস নেতা ও কর্মীকে কারারুদ্ধ এবং কংগ্রেসকে বে-আইনী ঘোষণা করে। ফলে দেশব্যাপী গণবিক্ষোভ শুরু হয়। এটিই 'আগস্ট আন্দোলন' নামে পরিচিত। এই আন্দোলন সারাদেশে ব্যাপক সহিংস আন্দোলনে রূপ নেয়। তুলনাহীন হিংসাত্মক হাঙ্গামা ও ব্যাপক নিষ্ঠুর তৎপরতায় প্রশাসনকে অচল করে দেওয়ার পদক্ষেপ নেয়া হয়। সংঘর্ষে উভয় পক্ষের বহু লোক হতাহত হয়। কংগ্রেসের বাইরের সমস্ত রাজনৈতিক দল ও নেতৃত্ব যেমন- মুসলিম লীগ, লিবারেল, হিন্দু মহাসভা, ন্যাশনাল ডেমোক্রেট, কমিউনিস্টরা এ আন্দোলন অনুমোদন করেনি। যা হোক, শেষ পর্যন্ত সরকার কঠোর হাতে এ আন্দোলন দমন করে। গান্ধীসহ বহু কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করা হয়।

৪.৩ ১৯৪৩ সালে বাংলায় দুর্ভিক্ষ

ভারতের রাজনীতির উপরোক্ত পটভূমিকায় বাংলায়ও রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন হয়। ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রীসভার পতনের পর মুসলিম লীগ বাংলার শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করে। খাজা নাজিম উদ্দিনের নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। এসময় বাংলায় এক ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সর্বনাশা এ দুর্ভিক্ষে ৩০ লক্ষাধিক লোক প্রাণ হারায়। অবশ্য লীগমন্ত্রী সভার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বহু জীবন রক্ষা পায়।

৪.৪ লীগ-কংগ্রেস সমঝোতার প্রয়াস, ১৯৪৪

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ক্রীপস প্রস্তাব কংগ্রেস ও মুসলিম লীগকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। এ সময় কংগ্রেস 'অখণ্ড ভারত' এবং মুসলিম লীগ লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ভারত বিভক্তির দাবিতে অটল থাকে। ভারতীয় রাজনীতির এ পটভূমিতে কংগ্রেসের অন্যতম কর্ণধার রাজা গোপাল আচারী তাঁর দলকে মুসলিম লীগের দাবি বিবেচনা করে দেখার পরামর্শ দেন। ১৯৪৪ সালে গান্ধী-জিন্নাহর মধ্যে সমঝোতা বৈঠক হয়। কিন্তু এতে সমস্যার কোন সমাধান হয়নি। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ কোন সমঝোতায় পৌঁছতে পারেনি।

৪.৫ ১৯৪৬ সালের নির্বাচন

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্র বাহিনী জয়লাভ করে। যুদ্ধ শেষে ব্রিটেনে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে চার্চিলের রক্ষণশীল দলকে পরাজিত করে শ্রমিক দল ক্ষমতা দখল করে। মি. এ্যাটলী ক্লিমেন্ট নতুন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ভারতীয়দের স্বাধীনতার দাবির প্রতি সহানুভূতিশীল নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রী ১৯৪৬ সালে ভারতে সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দেন। ঘোষণা অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে মুসলিম লীগ আশাতীত সাফল্য লাভ করে। এ নির্বাচনে মুসলিম লীগ ভারতীয় মুসলমানদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজের অবস্থান পাকাপোক্ত করে।

সার-সংক্ষেপ

১৯৪২-৪৬ সাল পর্যন্ত সময়কাল ভারতের রাজনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪২ সালে দূর প্রাচ্যে মিত্র বাহিনীর ভাগ্য বিপর্যয়ের পটভূমিতে আন্তর্জাতিক চাপ ও ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে ব্রিটিশ সরকার ১৯৪২ সালে ক্রীপস মিশন প্রেরণ করে। ভারতের শাসনতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক সংকট সমাধানের জন্য মিশন যে প্রস্তাব পেশ করে, তা 'ক্রীপস প্রস্তাব' নামে পরিচিত। কিন্তু ক্রীপস প্রস্তাব ভারতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগসহ কোন রাজনৈতিক দলের কাছেই গ্রহণযোগ্য হয়নি। ফলে এটি ব্যর্থ হয়। এসময় কংগ্রেস ভারত ছাড় আন্দোলন শুরু করে। সরকার কঠোর হস্তে এ আন্দোলন দমন করেন। এসময় বাংলায় এক ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষে কয়েক লক্ষ লোকের প্রাণহানী ঘটে। ১৯৪৪ সালে লীগ-কংগ্রেসের মধ্যে একটি সমঝোতা উদ্যোগ ব্যর্থ হয়। এই পরিস্থিতিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে এবং ব্রিটেনে রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন হয়। ১৯৪৬ সালে ভারতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে মুসলিম লীগ আশাতীত সাফল্য অর্জন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৪.৪

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন :

১. স্ট্যাপোর্ড ক্রীপসকে ভারতে পাঠান—
ক. এ্যাটলী ক্লিমেন্ট খ. রামসে ম্যাকডোলান্ড
গ. উইনস্টন ঘ. আরউইন

২. আগস্ট আন্দোলন হয়েছিল—
ক. ১৯৪০ সালের আগস্ট মাসে খ. ১৯৪১ সালের আগস্ট মাসে
গ. ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে ঘ. ১৯৪৩ সালের আগস্ট মাসে

৩. ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময় বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন—
ক. সোহরাওয়ার্দী খ. খাজা নাজিম উদ্দিন
গ. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ঘ. নওয়াব আলী চৌধুরী

খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. ক্রীপস ____ সালের ২৩ মার্চ _____ এসে পৌঁছান।
২. ১৯৪৪ সালে _____ ও _____ মধ্যে সমঝোতা বৈঠক হয়।

গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন

১. স্ট্যাপোর্ড ক্রীপস ছিলেন ভারত সচীব।
২. ১৯৪৪ সালে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যকার সমঝোতা প্রয়াস ব্যর্থ হয়।

ঘ. এক কথায় উত্তর দিন

১. স্ট্যাপোর্ড ক্রীপস কে ছিলেন?
২. কোন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে আগস্ট আন্দোলন হয়েছিল?

ঙ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. ক্রীপস প্রস্তাবের শর্তাবলী কি ছিল?
২. ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করুন।

পাঠ-৫ : ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা (১৯৪৬)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি—

☞ ক্যাবিনেট মিশন প্রেরণের পটভূমি বর্ণনা করতে পারবেন।
☞ ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা আলোচনা করতে পারবেন।
☞ ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৫.১ ক্যাবিনেট মিশন প্রেরণের পটভূমি

১৯৪২ সালের ক্রীপস প্রস্তাব ভারতের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয়। 'অখণ্ড ভারত' নীতিতে কংগ্রেসের অটল অবস্থান এবং জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আপোষহীন দাবি ক্রীপস প্রস্তাবের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। ভারতের রাজনীতির এরূপ অবস্থায় কংগ্রেসের অন্যতম কর্ণধার রাজা গোপাল আচারী তাঁর দলকে মুসলিম লীগের দাবি বিবেচনা করে দেখার পরামর্শ দেন। ১৯৪৪ সালে গান্ধী ও জিন্নাহর মধ্যে এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন সমাধান হয়নি। ১৯৪৫ সালে ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার জন্য সিমলায় সব রাজনৈতিক দলের সাথে আলোচনার বৈঠকে বসেন। কিন্তু এ বৈঠকও ব্যর্থ হয়।

এদিকে ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে ইংল্যান্ডে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে শ্রমিক দল বিজয়ী এবং মি. এ্যাটলী প্রধানমন্ত্রী হন। শ্রমিল দল ভারতীয়দের স্বাধীনতার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। ক্ষমতা লাভের পরই নতুন প্রধানমন্ত্রী ১৯৪৬ সালের জানুয়ারি মাসে ভারতে সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দেন। একই সাথে শাসনতান্ত্রিক সংকট নিরসনের লক্ষে ভারতে একটি মিশন প্রেরণের ঘোষণা দেন। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভারত সচিব পেথিক লরেন্সের নেতৃত্বে তিন সদস্যের যে মিশন ভারতে পাঠান ইতিহাসে তা 'ক্যাবিনেট মিশন' বা 'মন্ত্রী মিশন' নামে পরিচিত। এ মিশনের অপর দুজন সদস্য ছিলেন স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস এবং এ.ভি. আলেকজান্ডার।

৫.২ ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা

১৯৪৬ সালের ২৪ মার্চ ক্যাবিনেট মিশন ভারতে আসে। মিশন পর্যায়ক্রমে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগসহ রাজনৈতিক দলসমূহের নেতা, প্রদেশসমূহের প্রধানমন্ত্রী, সংখ্যালঘু নেতা ও দেশীয় রাজ্যসমূহের রাজাদের সাথে মতবিনিময় এবং এদের দাবি ও মতামত পর্যালোচনা করে ১৬ মে একটি নিজস্ব প্রস্তাব বা পরিকল্পনা পেশ করে, যা 'ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা বা প্রস্তাব' নামে পরিচিত। এ পরিকল্পনার রূপরেখা ছিল নিম্নরূপ :

ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনায় ভারতে তিন স্তরবিশিষ্ট একটি ফেডারেশন বা যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করা হয়—

১. কেন্দ্রে একটি অন্তর্বতীকালীন সরকার গঠন করা হবে।
২. ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যসমূহ নিয়ে একটি স্বায়ত্তশাসিত ভারতীয় ইউনিয়ন গঠন করা হবে। এ ইউনিয়নের হাতে থাকবে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা এবং মুদ্রা বিভাগ। অন্যান্য বিষয় থাকবে প্রদেশের হাতে।
৩. প্রদেশসমূহকে তিনটি বিশেষ গ্রুপে ভাগ করা হবে- ক. হিন্দু প্রধান প্রদেশ, খ. মুসলমান প্রদেশ এবং গ. বাংলা ও আসাম প্রদেশ। প্রত্যেক গ্রুপের জন্য একটি গণপরিষদ থাকবে।

ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাবে আরও বলা হয় যে, প্রত্যেক গ্রুপের সদস্যগণ সম্মিলিতভাবে সমগ্র ভারতের জন্য একটি সংবিধান রচনা করবে। এ প্রস্তাবের শর্তারোপ করা হয় যে, এই পরিকল্পনা গ্রহণ করলে পুরোটাই গ্রহণ করতে হবে, অংশবিশেষ গ্রহণ করা যাবে না।

৫.৩ ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার প্রতিক্রিয়া

ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা ভারতীয় রাজনীতিতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। কেননা এর মাধ্যমে ভারতীয়দের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরে ব্রিটিশ নীতির সুস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই পরিকল্পনাটির খুঁটিনাটি বিচার-বিশ্লেষণ করতে থাকে। এক কেন্দ্রীক সরকার গঠনের প্রস্তাবের মধ্যে কংগ্রেস 'অখণ্ড ভারত' প্রতিষ্ঠার সুযোগ দেখতে পায়। তবে গ্রুপিং ব্যবস্থা তাদের অসন্তুষ্ট করে। অন্যদিকে গ্রুপিং ব্যবস্থায় মুসলিম লীগ খুশি হয়। কেননা এর মধ্যে তারা তাদের পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা দেখে। তাই তারা ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কংগ্রেস গ্রুপিং ব্যবস্থা এবং

কেন্দ্রীয় সরকারের সদস্যদের মধ্যে লীগ ও কংগ্রেসের সংখ্যা সাম্য নীতি ছাড়া পরিকল্পনার অন্যান্য অংশে অংশগ্রহণ করে। যদিও পরিকল্পনার শর্ত মোতাবেক আংশিক গ্রহণের অবকাশ ছিল না। এমতাবস্থায় মুসলিম লীগ সরকার গঠনের সুযোগ দাবি করলে ব্রিটিশ সরকার গড়িমসি করতে থাকে। এ সময় কংগ্রেসের কার্য-কলাপ সম্পর্কেও লীগের সন্দেহ হয়। ফলে মুসলিম লীগও ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা গ্রহণের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নেয়। এতে মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা কার্যত ব্যর্থ হয়।

সার-সংক্ষেপ

ক্রীপস প্রস্তাবের ব্যর্থতার পর ভারতের শাসনতান্ত্রিক সংকট সমাধানে গান্ধী-জিন্নাহ আলোচনা ও সিমলা বৈঠক কোন ইতিবাচক ফলাফল আনতে পারেনি। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে ইংল্যান্ডের শ্রমিক সরকারের নতুন প্রধানমন্ত্রী মি. এ্যাটলী ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং শাসনতান্ত্রিক সংকট নিরসনের দায়িত্ব দিয়ে একটি ক্যাবিনেট মিশন পাঠান। এই মিশন যে পরিকল্পনা পেশ করে তাতে ভারতীয়দের কাছে ব্রিটিশ সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়টি ছিল সুস্পষ্ট। অবশ্য এ পরিকল্পনা গ্রহণে কংগ্রেসের অসহযোগিতা এবং আংশিক গ্রহণের ইচ্ছা ইত্যাদি কারণে শেষ পর্যন্ত পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৪.৫

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন :

১. ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়—

ক. ১৯৪২ সালে খ. ১৯৪৪ সালে

গ. ১৯৪৫ সালে ঘ. ১৯৪৬ সালে

২. ক্যাবিনেট মিশনের নেতৃত্ব দেন—

ক. লর্ড মাউন্ট ব্যাটন খ. এ.ভি. আলেকজান্ডার

গ. পেথিক লরেন্স ঘ. স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস

খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. ____ সালের _____ ক্যাবিনেট মিশন ভারতে আসে।

২. ____ ও _____ উভয়েই পরিকল্পনাটির খুঁটিনাটি পর্যালোচনা করে।

গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন

১. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে।

২. ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনায় ভারতে একটি তিন স্তরবিশিষ্ট ফেডারেশন গঠনের প্রস্তাব করা হয়।

ঘ. এক কথায় উত্তর দিন

১. ক্যাবিনেট মিশনে নেতৃত্বদানকারী ভারত সচীবের নাম কি?

২. ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশসমূহকে কয়টি গ্রুপে ভাগ করার প্রস্তাব করা হয়।

ঙ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা দিন।

২. ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ-৬ : স্বাধীন অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ (১৯৪৭)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- ☞ ১৯৪৭ সালে স্বাধীন অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের পটভূমি বর্ণনা করতে পারবেন।
- ☞ এ উদ্যোগের প্রকৃতি আলোচনা করতে পারবেন।
- ☞ এ উদ্যোগের ব্যর্থতার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের প্রাক্কালে বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী স্বাধীন, সার্বভৌম অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর এ উদ্যোগের সঙ্গে বাংলার কতিপয় প্রভাবশালী হিন্দু-মুসলিম নেতা একাত্মতা প্রকাশ করে। কিন্তু নানা কারণে এ উদ্যোগটি ব্যর্থ হয়। যদি এ উদ্যোগটি সফল হতো তবে ভারত ও পাকিস্তানের সাথে অখণ্ড বাংলাও একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হতো।

৬.১ অখণ্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের পটভূমি

ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার পর ভারতের রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবল অস্থিরতা ও নৈরাজ্য দেখা দেয়। পাকিস্তান অর্জনের দাবিতে মুসলিম লীগ 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' কর্মসূচি ঘোষণা করে। ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' পালনের দিন কলকাতায় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা শুরু হয়। ক্রমে এ দাঙ্গা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। হাজার হাজার নিরীহ মানুষ নিহত হয়। এ সময় ভারতীয়দের স্বাধীনতার দাবিও তীব্র আকার ধারণ করে। এমতাবস্থায় ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মি. এ্যাটলী ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণা দেন। এ ঘোষণায় ভারত বিভক্তি এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ঈঙ্গিত ছিল। এমতাবস্থায় কালবিলম্ব না করে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশকে হিন্দু-মুসলিম এলাকায় বিভক্ত করার প্রস্তাব করে। হিন্দু মহাসভা বাংলাকে বিভক্ত করে হিন্দু প্রধান অঞ্চল নিয়ে 'পশ্চিম বাংলা প্রদেশ' গঠন এবং একে ভারতীয় ইউনিয়নের সাথে যুক্ত করার জন্য আন্দোলন শুরু করে। কলকাতার বাঙালি-অবাঙালি শিল্প ও বণিক সমিতিসমূহ এ আন্দোলনের সমর্থনে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসে। হিন্দু মালিকানাধীন সংবাদপত্রসমূহ এ ব্যাপারে জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এমন এক পরিস্থিতিতে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী স্বাধীন অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

৬.২ উদ্যোগের গতি-প্রকৃতি

১৯৪৭ সালের ২৭ এপ্রিল দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে সোহরাওয়ার্দী আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের কথা ঘোষণা করেন। তিনি দীর্ঘ বক্তৃতায় বাংলা বিভক্তির যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি আবুল হাশিম, শরৎচন্দ্র বসু এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সংসদীয় দলের নেতা কিরণ শংকর রায় এ উদ্যোগের প্রতি তাদের জোরালো সমর্থন ব্যক্ত করেন। ১৯৪৭ সালের ২০ মে শরৎচন্দ্র ও সোহরাওয়ার্দীর উদ্যোগে এ ব্যাপারে বাংলার হিন্দু-মুসলিম নেতৃবৃন্দের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়, যা বসু-সোহরাওয়ার্দী প্রস্তাব নামে পরিচিত।

৬.৩ বসু-সোহরাওয়ার্দী প্রস্তাবের মূল বিষয়বস্তু

বসু-সোহরাওয়ার্দী প্রস্তাবে বলা হয় যে, বাংলা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হবে। এ স্বাধীন বাংলার শাসনতন্ত্রে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা অনুপাতে আসন সংরক্ষণসহ যুক্ত নির্বাচন ও প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে আইনসভা নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকবে। নতুন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী আইনসভা ও মন্ত্রীসভা গঠিত না হওয়া পর্যন্ত বাংলায় হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সকল চাকরিতে সমান অংশ থাকবে।

৬.৪ উদ্যোগের প্রতিক্রিয়া

সোহরাওয়ার্দীর স্বাধীন অখণ্ড বাংলা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের প্রতি বাংলার গভর্নর স্যার এফ. বারোজ এবং ভারত সচীব লিস্ট ওয়েলের পূর্ণ সমর্থন ছিল। ভারতের ভাইসরয় লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন প্রথমে এর বিরোধিতা করলেও পরে বারোজের প্রচেষ্টায় সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান অঞ্চল নিয়ে একটি রাষ্ট্র গঠন প্রধান লক্ষ্য হলেও নানা কারণে মুসলিম লীগ নেতা মুহাম্মদ আলী জিন্নাহও সোহরাওয়ার্দীর এ উদ্যোগে সম্মতি জানিয়েছিলেন। এ উদ্যোগের প্রতি কংগ্রেসের হাইকমান্ড বিশেষ করে নেহেরু ও প্যাটেলের প্রতিক্রিয়া আদৌ সহায়ক ছিল না। প্যাটেল এ পরিকল্পনাকে একটি ফাঁদ হিসেবে আখ্যায়িত করে হিন্দু ও কংগ্রেস নেতাদের এ ফাঁদে পা না দেওয়ার ব্যাপারে সর্তক করে দেন। হিন্দু

মহাসভার মনোভাবও এরূপই ছিল। সোহরাওয়ার্দী কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার বিরোধিতাকে 'পরাজিতের মানসিকতা' হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

৬.৫ স্বাধীন অখণ্ড বাংলা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের ব্যর্থতা

সার্বভৌম অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগটি ব্যর্থ হয়। পণ্ডিতদের মতে, এ উদ্যোগের প্রতি প্রয়োজনীয় জনসমর্থন তৈরির জন্য পর্যাপ্ত সময়ের স্বল্পতা, হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেসের হাইকমান্ডের তীব্র বিরোধিতা এ উদ্যোগের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। তদুপরি উদ্যোক্তাদের ব্যক্তিত্বের সংঘাত এবং ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এ উদ্যোগকে দুর্বল করে। তাছাড়া কংগ্রেস মুসলিম লীগের পাকিস্তান প্রস্তাব মেনে নেওয়ায় পরিস্থিতি ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে। ফলে স্বাধীন অখণ্ড বাংলা গঠনের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়।

সার-সংক্ষেপ

ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার ব্যর্থতার পরে ভারতের এক অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মি. এ্যাটলী ভারতীয়দের স্বাধীনতা দানের ঘোষণা দেন। এমতাবস্থায় বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী স্বাধীন অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। শরৎচন্দ্র বসু, আবুল হাশিম সহ বাংলার অনেক প্রভাবশালী হিন্দু-মুসলিম নেতা এতে সমর্থন জ্ঞাপন করেন। জিন্নাহ এমনকি ব্রিটিশ প্রশাসনও এ উদ্যোগের প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাব ব্যক্ত করে। কিন্তু হিন্দু মহাসভা ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এ উদ্যোগের তীব্র বিরোধিতা করে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে বাংলা বিভক্তির দাবি জানায়। তাদের অটল অবস্থানের কারণে শেষ পর্যন্ত স্বাধীন অখণ্ড বাংলা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ ব্যর্থ হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৪.৬

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন :

১. প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের কর্মসূচি দিয়েছিল—
- ক. জাতীয় কংগ্রেস
- খ. মুসলিম লীগ
- গ. কৃষক-প্রজা পার্টি
- ঘ. জমিয়ত-ই-ইসলাম দল

২. বসু-সোহরাওয়ার্দীর প্রস্তাব ছিল—
- ক. ভারতের স্বাধীনতার
- খ. ভারত বিভাগের
- গ. স্বাধীন অখণ্ড বাংলার
- ঘ. বাংলা বিভক্তির

৩. বসু-সোহরাওয়ার্দীর প্রস্তাবকে সমর্থন করেন বাংলার গভর্নর—
- ক. স্যার এফ. বারোজ
- খ. লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন
- গ. ব্যামফিল্ড ফুলার
- ঘ. এফ.জি. ল্যাংলী

খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. পাকিস্তান অর্জনের দাবিতে ____________ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম কর্মসূচি ঘোষণা করে।

২. বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ________ স্বাধীন অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মূল উদ্যোক্তা ছিলেন।

গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন

১. স্বাধীন অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মূল উদ্যোক্তা ছিলেন সোহরাওয়ার্দী।

২. কংগ্রেসের হাইকমান্ড স্বাধীন অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা উদ্যোগকে সমর্থন জানান।

ঘ. এক কথায় উত্তর দিন

১. বাংলার কোন মুখ্যমন্ত্রী স্বাধীন অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিলেন?

২. লিস্ট ওয়েল কে ছিলেন?

ঙ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. স্বাধীন অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পটভূমি আলোচনা করুন।

২. স্বাধীন অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের ব্যর্থতার কারণ কি?

পাঠ-৭ : ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন : স্বাধীন ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি -

- ☞ ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে পারবেন।
- ☞ ভারত স্বাধীনতা আইনের মূল বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে পারবেন।
- ☞ ভারত স্বাধীনতা আইনের প্রতি কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ☞ স্বাধীন ভারত ও পাকিস্তানের অভ্যুদয় সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।

ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে ১৯৪৭ সাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এ বছর ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে। এজন্য ব্রিটিশ পার্লমেন্টে একটি আইন পাস করা হয়। ইতিহাসে এ আইনটি 'ভারত স্বাধীনতা আইন' নামে পরিচিত। এই আইনের ভিত্তিতেই ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হয় এবং স্বাধীন ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে।

৭.১ ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের প্রেক্ষাপট

ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার ব্যর্থতার পর ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি গুরুতর আকার ধারণ করে। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধি পায়। হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের দ্রুত অবনতি ঘটে। পাকিস্তান অর্জনের দাবিতে মুসলিম লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করে। ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস পালন উপলক্ষে কলকাতাসহ সারা দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। এতে হাজার হাজার নিরীহ লোক প্রাণ হারায়। এসময় ব্রিটিশ সরকার বুঝতে পারে যে, ভারতীয়দের স্বাধীনতার আন্দোলন যেমন দমন সম্ভব নয়, তেমনি কংগ্রেস-লীগ বিরোধ নিষ্পত্তিও অসম্ভব। এমতাবস্থায় ব্রিটেনের সদ্য নির্বাচিত শ্রমিক দলীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী মি. এ্যাটলী ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণা দেন। তিনি বলেন যে, শাসনতন্ত্র সম্পর্কে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে সমঝোতা হোক বা না হোক ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যেই ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে ভারত ত্যাগ করবে। মি. এ্যাটলীর এ 'ফেব্রুয়ারি ঘোষণা' কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। উভয় দলই স্ব-স্ব অবস্থানে অনড় থাকায় পরিস্থিতি আরো জটিল আকার ধারণ করে। ফলে ভারত বিভক্তি অনিবার্য হয়ে পড়ে।

৭.২ ৩রা জুন পরিকল্পনা

সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে ভাইসরয় লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ব্রিটিশ সরকারের পরামর্শক্রমে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। এ পরিকল্পনাটি ঐতিহাসিক '৩রা জুন পরিকল্পনা' নামে পরিচিত। এ পরিকল্পনায় মুসলমানদের পাকিস্তান দাবি নীতিগতভাবে স্বীকার করে ভারত বিভক্তকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বাংলা, পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে ভারত বা পাকিস্তানে যোগদানের ব্যাপারে নিজেদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার দেয়া হয়। পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য ভারতীয় স্বাধীনতা বিল নামে একটি বিল ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পেশ করা হবে বলেও পরিকল্পনায় বলা হয়। এ সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে 'ভারত স্বাধীনতা আইন ১৯৪৭' পাস হয়।

১৯৪৭ সালের ভারত শাসন আইন একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ দলীল। এটি ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত রূপ। এ আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ ছিল—

৭.৩ ভারত স্বাধীনতা আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

ক. এই আইন ভারতে ব্রিটিশ শসনের অবসান ঘটায়। ভারতকে বিভক্ত করে ভারত ইউনিয়ন এবং পাকিস্তান নামে দুটি ডোমিনিয়ন সৃষ্টি করে। ডোমিনিয়ন দুটির আইনগত সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা হয়।

খ. এ আইনে বলা হয় যে, কেন্দ্রীয় শাসন ব্যাপারে উভয় ডোমিনিয়নে একজন করে গভর্নর জেনারেল থাকবেন। ডোমিনিয়ন মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী গভর্নর জেনারেল ইংল্যান্ডের রাজা কর্তৃক নিযুক্ত হবেন।

গ. ১৯৩৫ সালের আইন অনুযায়ী গঠিত আইনসভা গণপরিষদের মর্যাদা লাভ করে। এ গণপরিষদের হাতে স্ব-স্ব ডোমিনিয়নের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

ঘ. প্রতিষ্ঠিত ডোমিনিয়ন দুটি ব্রিটিশ কমনওয়েলথভুক্ত থাকবে কি-না, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বাধীনতা দেওয়া হয়।

ঙ. সিভিল সার্ভিস ও সশস্ত্র বাহিনীকে আনুপাতিক হারে দুই ডোমিনিয়নের মধ্যে ভাগ করা হয়।

চ. দেশীয় রাজ্যসমূহের উপর ব্রিটিশ সরকারের সকল প্রকার প্রাধান্যের অবসান ঘটে। এদেরকে স্বাধীন থাকতে বা ইচ্ছামত ভারত বা পাকিস্তানে যোগদানের স্বাধীনতা দেওয়া হয়।

৭.৪ কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়া

১৯৪৭ সালের ভারত শাসন আইনের প্রতি কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। এতে ভারত বিভক্তির যে প্রস্তাব করা হয় কংগ্রেস নেতা গান্ধী ও মাওলানা আবুল কালাম আযাদ তা মেনে নিতে অস্বীকার করেন। অবশ্য মাউন্ট ব্যাটেনের পরামর্শে নেহেরু ও প্যাটেল বিভক্তি প্রস্তাব মেনে নেয়। তাদের প্রভাবে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি নীতি পরিবর্তন করে এবং ভারতীয় জনগণকে বিভক্তি প্রস্তাব মেনে নেওয়ার আহ্বান জানায়। মাউন্ট ব্যাটেন ও প্যাটেলের সাথে সাক্ষাতের পর গান্ধীও তাঁর মনোভাব পরিবর্তন করেন। একমাত্র মাওলানা আযাদ অখণ্ড ভারত দাবিতে অটল থাকেন।

মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও মুসলিম লীগ মাউন্ট ব্যাটেন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, মুসলিম লীগের দাবি ছিল পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু, বেলুচিস্তান এবং বৃহৎ বাংলা ও আসাম নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। কিন্তু কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতিশীল মাউন্ট ব্যাটেন তাদের দাবি মেনে নেন নি। তিনি জিন্নাহকে 'অখণ্ড ভারত' অথবা খণ্ডিত পাঞ্জাব ও বাংলা নিয়ে পাকিস্তান এর যে কোন একটি বেছে নিতে বলেন। লীগের অনেকের আপত্তি সত্ত্বেও নিরূপায় জিন্নাহ ক্ষুদ্র পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণে বাধ্য হন।

৭.৫ স্বাধীন ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয়

১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন উক্ত সালের ১৪ এবং ১৫ আগস্ট কার্যকর করা হয়। ফলে ১৪ আগস্ট পাকিস্তান এবং ১৫ আগস্ট ভারত (হিন্দুস্থান) নামে উপমহাদেশে দুটি স্বতন্ত্র, স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হয়। ভারতে প্রায় দুশ বছরের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটে। উল্লেখ্য যে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয়কে মহামান্য ব্রিটিশ সম্রাটের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানানোর জন্য ভাইসরয় লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন করাচী উপস্থিত হন এবং ১৪ আগস্ট গণপরিষদে প্রদত্ত এক ভাষণে পাকিস্তান সৃষ্টিকে ঐতিহাসিক ঘটনা বলে আখ্যায়িত করেন। ১৫ আগস্ট দিল্লিতে ভারতে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানেও ভাইসরয় যোগ দেন। এভাবে উপমহাদেশে জন্ম নেয় 'ভারত' ও 'পাকিস্তান' নামের দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের।

সার-সংক্ষেপ

ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার ব্যর্থতার পটভূমিতে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে সীমাহীন মতানৈক্য, ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর ও ভারত বিভক্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই ভারত স্বাধীনতা আইন পাস করে। এ আইনের মাধ্যমে উপমহাদেশে প্রায় দু'শ বছরের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটে এবং জন্ম নেয় 'ভারত' ও 'পাকিস্তান' নামে দুটি স্বতন্ত্র, স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৪.৭

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন :

১. মুসলিম লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস ঘোষণা করে—
   ক. ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্টকে
   খ. ১৯৪৬ সালের ১৬ অক্টোবরকে
   গ. ১৯৪৭ সালের ১৬ আগস্টকে
   ঘ. ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টকে

২. ফেব্রুয়ারি ঘোষণা দেন—
   ক. লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন
   খ. মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ
   গ. মি. এ্যাটলী
   ঘ. লর্ড ওয়াভেল

৩. ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট স্বাধীনতা লাভ করেছে—
   ক. ভারত
   খ. করাচি
   গ. পাকিস্তান
   ঘ. বাংলাদেশ

খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. _____ সালের _____ আগস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস ঘোষণা করা হয়।
২. ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি ঘোষণায় _____ সালের______ মাসের মধ্যে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা বলা হয়।
৩. ১৯৪৭ সালের _____ আইন উক্ত সালের ১৪ ও ১৫ আগস্ট কার্যকর হয়।

গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন

১. কংগ্রেস প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আন্দোলন শুরু করে।
২. লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ছিলেন ব্রিটিশ ভারতের সর্বশেষ ভাইসরয়।
৩. ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট স্বাধীন ভারত ইউনিয়নের জন্ম হয়।

ঘ. এক কথায় উত্তর দিন

১. ১৯৪৭ সালের ভারত শাসন আইন কোন আইনের পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত রূপ?
২. '৩রা জুন পরিকল্পনা' কে প্রণয়ন করেন?
৩. কংগ্রেসের কোন নেতা শেষ পর্যন্ত অখণ্ড ভারত দাবিতে অটল থাকেন?

ঙ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. ভারত স্বাধীনতা আইনের প্রেক্ষাপট কি ছিল?
২. ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন পরিকল্পনা আলোচনা করুন।
৩. ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।
৪. কিভাবে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটেছিল?

চূড়ান্ত মূল্যায়ন : ১৪

বিশদ উত্তর প্রশ্ন

১. কৃষক-প্রজা পার্টির বিশেষ উল্লেখপূর্বক ১৯৩৭ সালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক নির্বাচনের অংশগ্রহণকারী প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের পরিচয় ও তৎপরতা আলোচনা করুন।
২. ১৯৩৭-১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ৪ টি বঙ্গীয় মন্ত্রীসভার পরিচয় দিন।
৩. লাহোর প্রস্তাবের মূল বিষয়বস্তু আলোচনা করুন। লাহোর প্রস্তাবকে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' বলা যায় কি?
৪. ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা কি ছিল? এ পরিকল্পনার প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করুন।
৫. ১৯৪৬ সালের স্বাধীন অখণ্ড বাংলা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ ও এর প্রতিক্রিয়া আলোচনা করুন।
৬. ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের পটভূমি ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।